ওভাল অফিসের বাকযুদ্ধ

আমেরিকা-ইউক্রেনের মিত্রতার সম্পর্কে যে চিড় ধরেছে তার সমাধানে সকল কূটনৈতিক পন্থা ব্যর্থ হওয়ার পর ওভাল অফিসের লাইভ অনুষ্ঠানেই এই দ্বন্দ্বের বিস্ফোরণ ঘটে -যেখানে বসে তারা প্রতিনিয়ত আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা সাজাতো। এটি বর্তমান সময়ে ক্রুসেড শিবিরের সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্ব, একথা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। তবে ক্রুসেইড ইতিহাসের কালো অধ্যায়গুলো ঘাটলে এমন ঘটনা নতুন বা অস্বাভাবিক কিছু মনে হবে না।

খুব দ্রুততার সাথে ক্রুসেডারদের এই সংকট ওভাল অফিস ছাড়িয়ে যায় এবং পুরো ইউরোপ জুড়ে তোলপাড় শুরু হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে তারা তড়িঘড়ি "জরুরী ইউরোপিয়ান শীর্ষ সম্মেলন" এর আহ্বান করে। তাদের ভাষ্যমতে এমন গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন শতাব্দীতে একবারের বেশি হয় না। এ সম্মেলনে দাওলাতুল ইসলামের হুমকি ও বিশ্বব্যাপী তাদের আক্রমণের মতো কোন ইস্যু ছিলো না! বরং এটি ডাকা হয় আমেরিকার নতুন অবস্থানকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাদের করণীয় ঠিক করার জন্য -যেখানে আমেরকা ইউরোপের ঐতিহাসিক সম্পর্ককে পাশ কেটে রাশিয়ার সাথে শান্তি চুক্তি করতে চাইছে, যেন তারা নিজেদের মধ্যাকার সংকটগুলোর দিকে মনোনিবেশ করতে পারে এবং "আমেরিকার স্বার্থ সবার আগে" নীতিতে আরো বেশি আত্মকেন্দ্রিক হতে পারে।

ওভাল অফিসের এই যুদ্ধ বলে দেয়, আমেরিকার অভ্যন্তরীণ সংকট নিরসন ও চীনের কমিউনিস্ট সরকারের সাথে ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষের কারণে মার্কিন প্রশাসন কি পরিমাণ চাপের মধ্যে পড়েছে। কেননা, ট্রাম্প ও তার প্রশাসন চাচ্ছে, তারা ইউরোপকে কঠিন এক শিক্ষা দিবে, এবং বিদ্যমান বাস্তবতায় তাদেরকে আর ফ্রী সেবা দিবে না! কিংবা এমন কোন সার্ভিস দেওয়া হবে না যাতে মার্কিন স্বার্থের অগ্রাধিকার নেই। এ বাকযুদ্ধে আরেকটি বিষয় প্রতিফলিত হয়; তা হলো, দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকা ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আমেরিকা ও ইউরোপের কপালে ভীষণ চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। কেননা এটি তাদেরকে অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে পঙ্গু করে দিচ্ছে, এবং তাদের প্রত্যাশার বিপরীত ফল ভোগ করতে হচ্ছে। তারা মনে করেছিলো, ইউক্রেনকে বলির পাঠা বানালে তারা নিজেদের ভূমিতে ক্রুসেড-ক্রুসেড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে বাঁচতে পারবে। কিন্তু তাদের আশা কেবল আশা-ই থেকে গেলো।

এই বাকযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার আগ থেকেই ইউরোপ তাদের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ব্যয় বৃদ্ধি শুরু করেছিলো, যেন নিজের পিঠ চুলকানোর কাজ নিজের নখ দিয়েই সারা যায়; যখন তারা দেখলো, আমেরিকা তার সমস্ত নখ ব্যবহার করেও চীনা এলার্জিতে পঁচন ধরা চামড়া সামলাতে পারছে না এবং "সন্ত্রাসী হুমকীর" মোকাবিলায় সে ইতিমধ্যেই কাবু হয়ে আছে। এখন ইউরোপ কিংবা তার কিছু অংশ মনে করছে, অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা ছাড়া নিরাপত্তার ভিন্ন কোনো বিকল্প নেই; কারণ আমেরিকা আর তাদের নিরাপত্তা প্রদান করতে সক্ষম নয়, কিংবা আগ্রহী নয়।

প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর ব্যয়বহুল অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের মানে হচ্ছে, মহাদেশটির সামনে প্রতিকূলতার ঝড় ধেয়ে আসছে -যা তাদেরকে খরচের হাত

সংকোচন ও বিলাসিতা বর্জনের সতর্কবার্তা দেয়। কেননা তাদের সামনে অপেক্ষা করছে কঠিন এক সময়। ক্রুসেড বিশ্বের এই বিভাজনের মুখে তাদেরকে নিরাপত্তা ও বিলাসিতার যে কোন একটি বেছে নিতে হবে। তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়, ক্রুসেডার সম্প্রদায় কি এ ধাক্কা সামলাতে পারবে? আর আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যদি ইউরোপ আমেরিকার থেকে প্রতিরক্ষা বিষয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে, তবে এটি 'ন্যাটো' জোটের ভবিষ্যতকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিবে। যার কারণে ক্রুসেডারদের পত্র-পত্রিকাগুলো এই প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হয়েছে যে, ইউরোপ-আমেরিকার এ বিভাজনের পরে ন্যাটো'র ভবিষ্যত কি হবে? আর দাওলাতুল ইসলামের মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক ক্রুসেড জোটের সক্ষমতা-ই বা কতটুকু থাকবে? যেখানে দাওলাহর সিংহপুরুষরা আজও ইউরোপ-আমেরিকা জুড়ে আক্রমণ পরিচালনা করে আসছে।

তাছাড়া ইউরোপের একটি অংশ আমেরিকার স্বার্থচর্চার বিরোধিতা করে ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা দেওয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। যার ফলে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন শত চেষ্টা করলেও "ইউরোপিয়ান জোট" ও "হোয়াইট হাউজ" -এর মাঝে সম্পর্কের উন্নয়ন ও সমন্বয় ঘটাতে ব্যর্থ হচ্ছে। হয়তো তারা এক পর্যায়ে এসে যে কোন একটি পথ বেছে নিতে বাধ্য হবে, তা যত কঠিন-ই হোক-না কেন। (হয় নিজেদের মধ্যে ভাঙ্গন, নয়তো আমেরিকার বিরুদ্ধে যাওয়া)

ইউরোপ তার সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করাকে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি জরুরি বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে। অন্যদিকে রাশিয়া এই ইউরোপীয় সামরিক উত্তেজনাকে সংঘর্ষ এবং যুদ্ধ উসকে দেওয়ার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখে। যা রাশিয়ান কর্মকর্তারা কোন রাখঢাক ছাড়াই বলে আসছে ফলে এই প্রথম বারের মতো ইউরোপের ভূমিতে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো এবং এত বছর ধরে ইউক্রেনকে ব্যবহার করে নিজ ভূমিতে যুদ্ধ এড়ানোর যে কৌশল নিয়েছিলো তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। এজন্য ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলতে বাধ্য হয়েছে, "পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে যুদ্ধের ফ্রন্ট লাইন আমাদের আরও বেশি নিকটবর্তী হচ্ছে।"

এসব কিছু ইঙ্গিত দেয় যে, আমেরিকা ও ইউরোপের যৌথ বিশ্ব ব্যবস্থার পতন হতে যাচ্ছে, এবং তারা কর্তৃত্ব হারাতে চলছে। এই পতনের ফলে নতুন নতুন জোট এবং সংগঠন সৃষ্টি হতে পারে, যারা প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বার্থ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে হাঁটবে। যার ফলে পৃথিবী আবারও যুদ্ধ এবং সংঘর্ষের যুগে ফিরে যাবে। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপীয়রা নিজেদের ভূমিতে যুদ্ধ এড়ানো যে চেষ্টা করে আসছিলো তা ব্যর্থ হবে। এই হলো ক্রমবর্ধমান ক্রুসেডীয় বিভাজনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র। এখানে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণীর বাস্তব রূপও দেখতে পাই। তিনি ﷻ বলেন:

{فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ}.

{ফলে আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক রেখেছি।}

মানহাজগত দৃষ্টিকোণ: ওভাল অফিসে যে টানাপোড়েন আমরা দেখেছি এটাই মূলত জাহেলী রাজনীতির বাস্তব প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এই রাজনীতির গোলক ধাঁধাতেই আটকে যায় ফিতনাগ্রস্থ কিছু জিহাদীরা - যারা সময়ের আবর্তনে সত্যবিচ্যুত হয় এবং নিজেদের পদস্থলন আড়াল করতে শারীয়া নিয়ে মিথ্যাচার করে। তাওহীদ প্রতিষ্ঠার যে পন্থা রাসূল ﷺ এর যামানা থেকে আজ পর্যন্ত হকপন্থীরা অনুসরণ করে আসছে -তার বিপরীতে শয়তান তাদের সামনে ভ্রান্ত চিন্তা তুলে ধরেছে আর এটাকেই তারা শারীয়াহ বানিয়ে নিয়েছে।

এখানে তাদের জন্য একটি বার্তা আছে, যারা আন্তর্জাতিক সমাজের কাছে ধরনা দিচ্ছে এমন এক সময়ে এসে, যখন এর তারকা স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে এবং ভিত্তি ভেঙ্গে পড়ছে। আমরা সেসকল মুরতাদ দল ও সংগঠনের কথা বলছি, যারা আন্তর্জাতিক সমাজের কাছে ধরনা দিতে পেরে নিজেদেরকে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী মনে করে এবং এর মাধ্যমে আমেরিকার সাহায্য সহযোগিতা পায় কিংবা তাদের শাস্তি থেকে মুক্তি মেলে। একই সময়ে আমেরিকা তাদের নিজ ক্রুসেডার মিত্রদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছে এবং নানা নিষেধাজ্ঞা ও শাস্তি চাপিয়ে দিচ্ছে। এখন প্রশ্ন হলো, আরবের এই মুরতাদরা কি "আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়"এ জায়গা পাবে? যেখানে তারা ইউরোপের আপন সন্তানদেরকেই পাত্তা দিচ্ছে না? আর খোলস পাল্টানো "জেলেনস্কি"এর কি পরিণতি হবে? যেখানে "জেলেনস্কি" তাদের অপমান ও লাঞ্ছনার স্বীকার হচ্ছে আন্তজার্তিক সম্প্রদায়ের নিজ ভূমিতে? মালি থেকে দামেস্ক পর্যন্ত কাঁদা মাটিতে আটকে পড়া কথিত এই জিহাদীদের উদ্ধারে পশ্চিমা সমাজ এগিয়ে আসবে কি?

এটা খুব ন্যায়সংগত বিষয় যে, আন্তর্জাতিক ক্রুসেডারদের শিবিরে এই বিভাজন ঘটলে বড়

ধরনের সমস্যার সম্মুখিন হবে এমন কিছু গোষ্ঠী -যারা এই শিবিরে ভর করে তাদের সরকার বা প্রকল্প দাঁড় করিয়েছিলো এবং নিজেদের ভাগ্য তাদের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়েছিলো। অপরদিকে এই বিভাজন ও বিশৃঙ্খলার ফলে লাভবান হবে তারা, যারা এই বৈশ্বিক জোটের গলার কাঁটা হয়েছিলো, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য "আন্তর্জাতিক জোট" গঠন করা হয়েছিলো। কাজেই, খিলাফাহর সৈনিক ও আনসারদের উচিত এই বিভাজনের সুযোগকে কাজে লাগানো। কোনভাবে এটিকে হাতছাড়া করা যাবে না এবং এখন থেকেই এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ: ইতিহাস থেকে আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বিভাজন ও বিভক্তি-ই ক্রুসেডারদের আসল চরিত্র। তারা কোন কিছুতেই ঐক্যমত হতে পারে না; এমনকি তাদের মিথ্যা উপাস্যদের বিষয়েও! সাম্প্রতিক ক্রুসেইড যুদ্ধসমূহে তারা যেভাবে বিভক্ত হয়েছে, তার অনুরূপ দৃষ্টান্ত তাদের অতীত ইতিহাসেও রয়েছে। তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থ ও মনোবাসনা নিয়ে যুদ্ধে নামে এবং স্বার্থ হাসিলে একে অপরকে ছাড়িয়ে যেতে চায়; কেউ কাউকে ছাড় দিতেও রাজি নয়! এভাবে তাদের মাঝে জন্ম নেয় পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুতা। ঠিক বিপরীত চিত্র দেখা যায় আল্লাহওয়ালাদের ক্ষেত্রে, যারা তাওহীদ ও জিহাদের উপর অটল-অবিচল থাকে। এটাই ক্রুসেডার রাষ্ট্রগুলোর বড় কষ্টের কারণ। যেখানে ক্রুসেডাররা তাদেরকে নিয়ে রাত-দিন ব্যস্ত থাকার পরও তারা হার মানছে না, আর যদি তারা নিজেদের দ্বন্দ্ব-কলহে ব্যস্ত হয়ে যায় তখন পরিস্থিতি কেমন হবে?!

পরিশেষে, চিন্তা করে দেখুন, হে রব্বে কারিমের ওয়াদায় দৃঢ় বিশ্বাস রাখা মুজাহিদ! দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তারা এত এত মিত্রজোট ও সভা-সম্মেলন করেছে; আজ এ সবকিছুই তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজও তারা সেই সভা-সম্মেলন করছে; তবে নিজেদের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ ও সংঘাত নিয়ে -যা এখনও কেবল সূচনাপর্বে রয়েছে। হে আল্লাহ, আপনি কাফেরদেরকে শতধা বিভক্ত করুন এবং তাদের দুর্ভোগ আরো বাড়িয়ে দিন।